যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ১০ জুলাই ২০১৭

কলকাতা

যুগশঙ্খ-র সঙ্গে ৮ পাতার রঙিন ক্রোড়পত্র

থার্ডআই ক্লিক: অফবিট কলকাতা

সরকারি হিসাবে এ-দেশে বর্ষা আসার তারিখ ৮ জুন। তবে সেজেগুজে, রেডি হয়ে আসতে আসতে দিন দশেক দেরি হয় প্রতিবছরই। অবশ্য, তিনি আসতে না আসতেই শুরু হয়ে যায় নতুন 'হ্যাপা'। রাস্তায় রাস্তায় জল। কোথাও গোড়ালি ডোবে তো কোথাও হাঁটু। একটু উঁচু জায়গা পেলে প্যান্ট গোটাতে গোটাতে চলতে থাকে কর্পোরেশনকে 'কাঁচা খিস্তি'। আরে মশাই, কর্পোরেশন কি শুধু 'বেরসিক' লোকেদের জন্যে? কর্পোরেশন, সরকার 'রসিক' মানুষের কথাও ভাবে। তাই তো তাঁদের জন্য ফোটো তোলার ব্যবস্থা করে দেওয়া...

ফোটো: **প্রীতম চক্রবর্তী** | লেখা: **অভিষেক আচার্য**

আমার চোখে কলকাতা

খরাজ মুখোপাধ্যায় (অভিনেতা)

কলকাতা বরাবরই হুজুগে। ভীষণ নাটুকে। যে কোনও একটা ঘটনা ঘটলেই সেটা যখন নিউজে আসে এবং তা নিয়ে মেতে ওঠে ফেসবুকে, হোয়াটসঅ্যাপে। মেতে উঠতে কলকাতার জুড়ি নেই।

কলকাতা ফুটবলের কলকাতা, খাবারের কলকাতা। নানানরকম খাবার এবং তা সস্তাও। আর সব খাবার অ্যাভেলেবলও এখানে। কলকাতা আবার কালচারেরও কলকাতা। বিভিন্ন রকমের কালচারের আদান-প্রদান হয় এখানে। আমাদের কলকাতা এমন একটা জায়গা যে সবাইকে ভীষণ আপন করে নিতে পারে খুব সহজেই। সে প্রবাসী হোক বা বিদেশি, যে মানুষই আসুক না কেন কলকাতা তাকে বন্ধু করে নেয় এবং বিপদে আপদে সবসময় তাকে সাহায্য করে। তবে মাঝেমধ্যে একটু অসন্তোষ দেখা দিচ্ছে, যা একেবারেই কাম্য নয়। কলকাতা একটা অন্যরকম প্রকৃতির জায়গা। ছোট ছোট অঞ্চলে যে অসন্তোষ দেখা দিচ্ছে সেটা খুবই খারাপ ব্যাপার। কিন্তু সবমিলিয়ে কলকাতা খুবই আমুদে। সবাই হই হই করে থাকতে ভালোবাসে।

আর পলিউশন নিয়ে যদি বলি তবে বলব, দিনকে দিন প্রচণ্ড অ্যাওয়ারনেস বাড়ছে, বাড়ানো হচ্ছে। এটা অবশ্য ঠিক বিদেশে যেমন একটা সিস্টেম আছে; কোনও একটা শহরে বা যে কোনও শহরকেই যদি ধরে নেওয়া হয় তার ৪০% অংশে বাড়ি-গাড়ি এসব থাকবে আর বাকি ৬০% প্রকৃতির জন্য ছেড়ে দেওয়া হবে, কোনও কারণেই সেটা ৪১% হবে না। এই যে প্রকৃতিকে আলাদা প্রেফারেন্স দেওয়া ইনিশিয়ালি সেই ব্যাপারটা হয়নি। এবার না হওয়ার ফলে যেটা হচ্ছে, সেটা হল পলিউশন বাড়ছে। তবে একটা জিনিস ঠিক যে, কেউ যদি ব্যাংকক ঘুরে আসে বা বিদেশের কোনও শহর ঘুরে আসে, আসার পর সে বুঝতে পারবে কলকাতা শহরের ট্রাফিক কী সুন্দরভাবে কন্ট্রোল করা হয় এবং ব্যবস্থাপনাটা কতটা স্মুথ। খেয়াল করে দেখলে দেখা যাবে দেশের বেশিরভাগ বড় আক্সিডেন্টগুলো কলকাতার বাইরেই হয়েছে।

আর নিরাপত্তা ব্যাবস্থার কথা বলতে গেলে বলতেই হয় অনেক জায়গার থেকে কলকাতার নিরাপত্তা ব্যবস্থা অনেক ভালো। মেয়েরা অনেক রাত অবধিই বাইরে থাকতে পারে নির্দ্বিধায়। যেটা অনেক শহরে পারে না।

ডেইলি প্যাসেঞ্জার @ কলকাতা

প্রতিবন্ধী সন্তানকে ব্যবহার করে...

তপন বসু

একটা সময় বাসজার্নি ব্যাপারটা ভীষণভাবে অ্যাভয়েড করতাম। কিন্তু কপাল। কাজের তাগিদে এখন রোজ করতে হয় বাসজার্নি। তাও আবার দু-দুবার। দাসনগর টু ধর্মতলা, নেক্সট ধর্মতলা টু রুবি। প্রথমটায় যেদিন যে বাস বাস পাই, তাতেই উঠে ধর্মতলা চলে যাই। আর সেকেন্ডটাইম ফরটি সেভেন বি। কারণ ওই রুটে বেশ কিছু বাস থাকলেও ওই বাসটাই বেশি নজরে পরে, তাই ওটাই ফিক্সড করে নিয়েছি।

বাসজার্নি আমার কাছে বরাবরই বিরক্তিকর। কারণ, বাসের ভেতরে লোকজনের উচ্চস্বরে কথাবার্তা, চেঁচামেচি, তর্কাতর্কি— এসব আমার ভীষণ অপছন্দের। অবশ্য গরমকালে আরও একটা সাংঘাতিক কারণ তৈরি হয়। সেটা হল ঘাম। হয়তো ভাগ্যের জোরে ওয়ান-থার্ড সিট পেয়েছি। কোনওমতে সিটের সেই অংশে আমার শরীরের টু-থার্ড গুঁজে ভিতরের চেঁচামেচি অ্যাভয়েড করে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছি। হঠাৎ আমার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটির (ভদ্র হতেও পারে) গাল চুঁয়ে টস করে একফোঁটা ঘাম আমার হাতে। কিছুটা বিরক্ত হয়ে তাঁকে পকেট থেকে রুমাল বের করে ঘাম মুছে নেওয়ার কথা বলাতে তিনিও ডাবল বিরক্তির সঙ্গে দাঁত খিঁচিয়ে বলে ওঠেন, 'দেখছেন না, ভিড়ের মধ্যে দু-হাত দিয়ে রড ধরে দাঁড়াতে হয়েছে।' অগত্যা তর্কাতর্কির মধ্যে না গিয়ে আড়চোখে ওই ব্যক্তির গালের দিয়ে চেয়ে থাকা, কখন আবার টস করে...। প্রথম প্রথম এ-সবে বেশ অসুবিধা হলেও এখন বেশ অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি।

একদিন ধর্মতলা থেকে যখন বাসে উঠলাম, দেখলাম বাস প্রায় ফাঁকা। তাই যথারীতি সামনের দিকে জানালার ধারের সিটে বসে পড়লাম। বাসটা সেদিন বেশ ভালো যাচ্ছিল। আমিও বাইরের দিকে হোর্ডিং দেখতে দেখতে চলেছি। রাসবিহারী ক্রসিং আসতেই ভিতরের দিকে তাকিয়ে দেখি বাসভর্তি লোক। আনমনা থাকায়, কখন বাস ভর্তি হল, বুঝতেই পারিনি। আবার তাকালাম বাইরের দিকে।

একটু পরেই হঠাৎ ঝাঁঝালো মহিলা কণ্ঠ, 'উঠুন, উঠুন, এটা হ্যান্ডিক্যাপড সিট। ছাড়ুন তাড়াতাড়ি।' চমকে ভেতরে তাকালাম। এক মহিলা তাঁর সন্তানকে নিয়ে স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার উদ্দেশ্যে বাসে উঠেছেন। বাচ্চাটির হাত দেখেই বোঝা গেল, বাচ্চাটি প্রতিবন্ধী। হ্যান্ডিক্যাপড সিটে বসে থাকা ভদ্রলোক সিট ছাড়লেন। বাচ্চাটি এবার সিটে বসতে যেতেই তার মা বললেন, 'আমি বসি, তুমি আমার কোলে বোসো।' তাই হল। বসেই মহিলা ফোন বের করে ঘাঁটতে শুরু করলেন। দু-তিন মিনিট পরেই সন্তানকে নির্দেশ, 'বাপন, একটু দাঁড়াও, আমার অসুবিধা হচ্ছে।' বাচ্চাটি কোল থেকে নেমে দাঁড়িয়ে পড়ল, মা হোয়াটসঅ্যাপ করতে থাকলেন।

আমি নেমে পড়লাম সিমেন্স স্টপেজে। সিগারেট ধরিয়ে বাচ্চাটার কথা ভাবলাম, রোজ ওকে কেউ ব্যবহার করে যাচ্ছে ক্ষণিকের সুখের জন্যে...

কলকাতা
যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ১০ জুলাই ২০১৭

সেন্ট পল’স ক্যাথিড্রাল চার্চ

সলমন হায়দার

‘লোক বাড়লে, ঘর বেশি লাগে’— ক্লাস ফাইভের ঐকিক নিয়মের চেনা ছকের এই সম্পর্ক সকলেরই জানা। কিন্তু মন্দির-মসজিদ-গির্জাগুলোও যে একই ছকে বাঁধা তার একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ সেকালের সেন্ট জন’স চার্চ তথা আজকের সেন্ট পল’স ক্যাথিড্রাল।

আধুনিকতার ছোঁয়া থেকে বাদ পড়েনি মন্দির-মসজিদ বা গির্জার মতো ধর্মীয় স্থাপত্যগুলিও। জনসংখ্যা বাড়ার সাথে-সাথে বেড়ে গেছিল তাদের আয়তন, সংখ্যা কিংবা পুনর্নির্মিত হয়েছিল নতুন ধাঁচে। মিশ্র সংস্কৃতির ইট-কাঠ-পাথরে নির্মিত এ প্রাণবন্ত শহরে চৌরঙ্গি চত্বরে অবস্থিত সেন্ট পল’স ক্যাথিড্রাল চার্চ তারই সাক্ষ্য বহন করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সেন্ট পল’স ক্যাথিড্রাল কলকাতার সবচেয়ে বড় এবং এশিয়ার প্রথম ‘এপিসকোপাল (বিশপের আওতাভুক্ত)চার্চ’।

ক্যাথিড্রাল চার্চের ইতিহাস জানতে গেলে ফিরে যেতে হয় অষ্টাদশ শতকে, যখন কলকাতায় ব্রিটিশদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৪৩০০ জন। এই সংখ্যক লোকের জন্য সেন্ট জন’স চার্চের আয়তন যথেষ্টই ছিল। কিন্তু ক্রমাগত আগ্রাসনের প্রভাবে বাড়তে থাকে ব্রিটিশদের সংখ্যা, প্রয়োজন হয়ে পড়ে নতুন চার্চের। গভর্নর জেনারেল হেস্টিংসের প্রস্তাবে সামরিক স্থপতিকার উইলিয়াম নারিন ফোর্বস তৈরি করেন নকশা, কিন্তু অধিক ব্যয়বহুল হওয়ায় প্রথমাংশে তা খারিজ হয়। পরে বিশপ ড্যানিয়েল উইলসনের অনুরোধে সহকারী সি. কে. রবিনসনের সহায়তায় ফোর্বস প্রণয়ন করেন সংশোধিত নকশা। ১৮৩৯ সালের ৮ই অক্টোবর সেইমতো শুরু হয় ‘ইন্দো-গথিক’ রীতির এই স্থাপনার কাজ। ৪,৩৫,৬৬৯ টাকা ব্যয়ে নির্মিত, ২৪৭ ফিট দৈর্ঘ্য ও ৮১ ফিট প্রস্থ সমন্বিত, ৮০০-১০০০ লোক ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন চার্চের। ক্যাথিড্রাল চার্চের কাজ শেষ হয় ১৮৪৭ সালে। রানি ভিক্টোরিয়ার পাঠানো সোনায় মোড়া রুপোলি উপহার, হাজার হাজার ইউরোপীয় এবং সাধারণ মানুষের উপস্থিতিতে খুলে ১৮৪৭ সালের ৮ অক্টোবর দ্বারোদ্ঘাটন হয় এই চার্চের।

১৮৯৭ এবং ১৯৩৪ সালে পর পর দু’বারের ভূমিকম্পের জীবন্ত রূপের কিছুটা মেটামরফোসিস ঘটাতে বাধ্য করেছিল। ভূমিকম্পে সব থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ২০১ ফিট উচ্চতা সম্পন্ন টাওয়ারটি পুনর্নির্মিত হয়। তবে এবার টাওয়ারটি তৈরি হয় ক্যান্টারবারি ক্যাথিড্রালের কেন্দ্রীয় হ্যারি বেল টাওয়ারের আদলে। ক্যাথিড্রালের নাম পরিবর্তন হয়ে সেন্ট পল’স ক্যাথিড্রাল হয়। টাওয়ারটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল এটি ৩ টন ওজনসম্পন্ন ৫টি ঘড়ি বহন করতে সক্ষম। ক্যাথিড্রাল কমপ্লেক্সেই রয়েছে ৬১ফিট×২২ফিট আয়তনের একটি লাইব্রেরি। লাইব্রেরিটির সূচনা হয় মূলত বিশপ উইলসনের হাত

ধরেই, যিনি প্রায় ৮০০০ বই এবং পাণ্ডুলিপি দান করেন লাইব্রেরিতে। লাইব্রেরিতে আরও রয়েছে মার্বেল পাথরে নির্মিত উইলসনের একটি ভাস্কর্য। উত্তর দিকে ক্যাথিড্রালে ঢোকার মুখে আছে বিরাট আকারের উইলয়ম প্রেন্টিস মেমোরিয়াল গেট। প্রায় ৬৫টি প্রজাতির সমন্বয়ে গঠিত সুন্দর বাগানের পরিবেষ্টনী, নিঃসন্দেহে ক্যাথিড্রালটির সৌন্দর্যায়নের মুকুটে বাড়তি পালক যোগ করেছে।

মূলত ক্যাথিড্রালটির প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই কলকাতায় খ্রিষ্টধর্মের প্রভাব বাড়তে শুরু করে। ঠিক একই সময়ে ইংল্যান্ডে চার্লস ডিকেন্সের লেখা ‘ক্রিসমাস ক্যারল’ নামক বইটি প্রকাশিত হলে, ইংল্যান্ড সহ সমগ্র খ্রিস্টান সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। সাধারণ মানুষ নতুন করে আবিষ্কার করেন প্রভু জিশুকে। আলোড়োনের জোয়ার থেকে বাদ পড়েনি কলকাতাও। বদলে গেছে ইতিহাসের অধ্যায়, রাজপাট গুটিয়ে দেশে ফিরে গেছে ইংরেজ। তবু এই চার্চের দেওয়ালে কান পাতলে শোনা যায় অতীতের পদধ্বনি।

ভারতের প্রথম আইসিএস সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

দোয়েল দত্ত

ব্রিটিশ ভারতে সাহিত্য-সংস্কৃতি থেকে ফ্যাশন, শিক্ষা-দীক্ষা থেকে শুরু করে আদবকায়দা— সর্বত্রই স্বীয় স্বাতন্ত্র্যের ছাপ রেখেছিল জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি। ঠাকুরবাড়ি মানে একদিকে যেমন প্রথাভাঙা, বিপ্লব, তেমনি চিরনূতনের আগমনও বটে। রবির সে আকাশে কিছু কম দীপ্যমান ছিলেন না জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তথা নতুনদাদা এবং মেজদাদা মানে কিনা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনিই ছিলেন ভারতের প্রথম আইসিএস— সিভিলিয়ান। যে যুগে নেটিভ ইন্ডিয়ানদের আইসিএস পরীক্ষায় বসে ইংরেজদের সমকক্ষ হতে দেওয়া যাবে না বলে নানারকম ফন্দি-ফিকির আঁটা হতো, সেই বদ্ধ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন এবং নোংরা রাজনীতিতে মহর্ষির এই দ্বিতীয় পুত্রটি যেন আক্ষরিক অর্থেই বিরলের মধ্যে ছিলেন বিরলতম প্রতিভা।

সত্যেন্দ্রনাথের জন্ম ১৮৪২ সালের ২ জুন, কলকাতাতে। ছেলেবেলার প্রথাগত শিক্ষা অতিক্রম করে কৈশোরে পা দেওয়ার পর থেকেই নতুন কিছু করার স্বপ্ন মনে দানা বাঁধছিল। আর সেই ইচ্ছা থেকেই স্থির করলেন সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় বসবেন। বাবামশায় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাতে কিঞ্চিৎ আপত্তি জানালেন, কেননা ব্রিটিশদের পক্ষপাতিত্বের কথা কারও অজানা ছিল না। কিন্তু ঠাকুরবাড়ির শৌর্য, বীর্য আর তেজ যাঁর মধ্যে আছে, তিনি কি অত সহজে দমবার পাত্র? উত্তরটা সকলেরই জানা। বন্ধু মনমোহন ঘোষকে সঙ্গে করে বিলেত যাত্রা করলেন কালাপানি পার হয়ে। ১৮৬৪-তে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় বসেন এবং সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। মনমোহন কৃতকার্য হতে না পারলেও সত্যেন ঠাকুর নিরাশ করেননি। এরপর দেশে ফিরে ১৮৭৪ সালের ১২ ডিসেম্বর সিভিলিয়ন হিসাবে ব্রিটিশ সরকারের চাকরিতে যোগদান করেন। প্রায় তিরিশ বছর আইসিএস হিসাবে

কাজ করে কর্মজীবনে সারা ভারতের অনেক জায়গাতেই ঘুরেছেন। বেশিরভাগটাই কাটিয়েছেন পশ্চিম ভারতে, বোম্বাই, আহমেদাবাদ ইত্যাদি অঞ্চলে। বাড়ির ছেলে বাড়ি থেকে অত দূরে আছে, সেজন্য প্রায়ই তাঁর কাছে ছুটে যেতেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ কিংবা রবির ন’দিদি স্বর্ণকুমারী দেবী। অবশেষে মহারাষ্ট্রের সাঁতরার জজ হিসাবে অবসর নিয়েছেন ১৮৯৭ সালে। চাকরিজীবনে তথাকথিত ‘কালাআদমি’দের ভিতর থেকে এসেও বেশ দক্ষতার সঙ্গে সামলেছিলেন তৎকালীন পরাধীন ভারতের শাসন আর আইনব্যবস্থার নানারকম জটিলতাকে।

কিন্তু বিলেতফেরত মেজদাদার মনে তখনও তোলপাড়। বাড়ির অন্দরমহলের পর্দাপ্রথার ঘোরতর বিপক্ষে ছিলেন তিনি। সবসময় মহিলাদের একমাথা ঘোমটা টেনে, গা ভর্তি গয়না পরে থাকাটাই ছিল জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির রেওয়াজ। কিন্তু এই কয়েদি বন্দোবস্ত সত্যেন্দ্রনাথের মনে হতো অন্য ধর্ম থেকে ধার করা, এই মধ্যযুগীয় রীতি থেকে কীভাবে সকলকে মুক্ত করা যায় সেই চিন্তাই ঘুরপাক খেত তাঁর মাথায়। যেমনভাবেই হোক বিদেশি আদব-কায়দার স্পর্শ এখানে কিছুটা হলেও নিয়ে আসতে হবে, কই সেখানে তো নারী-পুরুষের মেলামেশায় এত ঘেরাটোপ নেই। অবশেষে একদিন সুযোগ মিলল। যশোরের পিরালী ব্রাহ্মণ পরিবারের মেয়ে ন’বছরের জ্ঞানদানন্দিনী যখন সত্যেন্দ্রনাথের স্ত্রী হয়ে ঠাকুরবাড়ির প্রাঙ্গণ স্পর্শ করলেন, তখন থেকেই সত্যেন্দ্রনাথ তাঁকে নিজের ছাঁচে গড়েপিঠে নিতে শুরু করে দেন। নিজের স্ত্রীকে সঙ্গে করে বিলেতেও নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বাদ সাধলেন খোদ বাবামশায়। এরপর বোম্বেতে কর্মস্থলে অনেক অনুনয়-বিনয় করার পর জ্ঞানদাকে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি মিলল। সেখানকার মুক্ত আবহাওয়ায় জ্ঞানদা নিজেকে তৈরি করলেন সম্পূর্ণ আলাদা ধাঁচে। কলকাতায় ফেরার পর মেজো ছেলে আর পুত্রবধূর জীবনধারা দেখে মহর্ষি চারপাশের গঞ্জনার ভয়ে তাঁদের আর বাড়িতে রাখলেন না। পার্ক স্ট্রিটের নতুন বাড়িতে উঠে এসে বিলিতি জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়লেন সত্যেন্দ্র-জ্ঞানদা।

সত্যেন্দ্রনাথ বরাবরই রক্ষণশীলতার বিপক্ষে, বার বার ভালোবাসেন প্রথা ভাঙতে। স্ত্রীকে নিয়ে গভর্নর হাউসের পার্টিতে যেতেন, তাঁর বাড়ির পার্টির অতিথি-অভ্যাগতদের মধ্যেও আসতেন স্বনামধন্য ইংরেজরা। তবে, জীবনে প্রথম থেকেই স্বাদেশিকতার মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ। তাই বিলিতি আদব-কায়দা যতই রপ্ত করুন না কেন, বাঙালিয়ানাকে কখনওই বিসর্জন দেননি। আর সেজন্যই বোধহয় বড়লাটের দেওয়া পার্টিতে ধবধবে সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি পরিহিত সুদর্শন এসএন টেগোর সবসময়েই হয়ে উঠতেন আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু, চর্চার চরিত্র। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কন্যা, সৌদামিনী দেবীর লেখা থেকে জানা যায়, তাঁরা, মানে বাড়ির মেয়েরা যখন ঢাকা দেওয়া ঘোড়ার গাড়িতে চেপে গড়ের মাঠে হাওয়া খেতে যেতেন, তখন আশপাশের সমালোচনায় টেকা দায় হতো। আর বলাই বাহুল্য, মেয়েদের অন্তরমহল থেকে বাহিরমহলে নিয়ে আসায় সত্যেন ঠাকুরই ছিলেন প্রকৃত ও প্রধান পথপ্রদর্শক।

দীর্ঘদিন প্রবাসে থাকার ফলে সত্যেন্দ্রনাথ বিভিন্ন ভাষাতে পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন একক প্রচেষ্টাতে। এমনকী ‘গীতারহস্য’ ও তুকারামের প্রচুর পদ্যের তিনি বাংলায় অনুবাদও করেন। সত্যেন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ আসবে, আর হিন্দুমেলার কথা উঠবে না, তা হতে পারে না। দেশীয় মানুষদের মধ্যে স্বদেশি ভাবধারাকে আরও বেশি করে ছড়িয়ে দিতে নবগোপাল মিত্র ‘হিন্দুমেলা’-র প্রচলন করেন। এর প্রথম অধিবেশনে সত্যেন্দ্রনাথ উপস্থিত না থাকতে পারলেও, পরবর্তীতে দ্বিতীয় অধিবেশনে শুধু সোৎসাহে উপস্থিতই থাকেননি, স্বদেশ ও স্বাদেশিকতা নিয়ে নিজের স্পষ্ট মতামতও ব্যক্ত করেছেন। ফি বছর হওয়া এই মেলায় ঠাকুরবাড়ির প্রায় সকলেই অংশ নিতেন। সত্যেন্দ্রনাথ মেলায় গাইবার জন্য লিখলেন নতুন গান, তাঁর লেখনি থেকে বেরিয়ে এল, ‘মিলে সবে ভারতসন্তান, একতান মনপ্রাণ।’ সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী, একধারে কথাকার, সুরকার, অন্যদিকে লেখক, ভাষাতত্ত্ববিদ। বিশেষ করে মহিলাদের কী করে লেখাপড়া শেখানো যায়, নারী স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ কী, তা তিনি সমাজকে বোঝাতে আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন। ‘বালক’ পত্রিকাটি যখন ঠাকুরবাড়ির কচিকাঁচাদের জন্য জ্ঞানদানন্দিনী বের করলেন, তখন সত্যেন্দ্রনাথই ছিলেন প্রধান অনুপ্রেরণা।

এই বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন মানুষটির মৃত্যু হয় ১৯২৩ সালের ৯ জানুয়ারি। আর তার সাথেই হল জোড়াসাঁকোর আকাশে আর এক উজ্জ্বল নক্ষত্রের সমাপতন।

কলকাতা
যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ১০ জুলাই ২০১৭

তিলোত্তমার গ্রন্থসাহেব

বীথি চট্টোপাধ্যায়
(লেখিকা)

তেত্রিশ বছর কেটে গেছে। সেইদিনটা এখনও খুব স্পষ্ট হয়ে রয়ে গিয়েছে স্মৃতির ভিতর। ১৯৮৪ সালের ৩১ অক্টোবর। সেদিন সকালবেলা হঠাৎ পাড়াটাকে স্তব্ধ মনে হল। অন্যদিন পাড়ার কলে এইসময় লাইন পড়ে। আজ কলতলা শূন্য। পাড়ার রকে কোনও ছেলেপিলে নেই কেন? বাড়িগুলির জানালাগুলো যেন ঝটপট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বাড়ির ছাদগুলো শূন্য। অন্যদিন হলে এতক্ষণে স্নান সেরে ছাদে রোদ পোহায় অনেকে। অক্টোবর মাসের শেষ এটা। এখন কলকাতায় বেশ আমেজ ধরানো মৃদু ঠান্ডা। রোদ্দুরে জ্বালা নেই। কিন্তু আজ আমাদের উত্তর কলকাতার পাড়ায় হঠাৎ হলটা কী? একটু আগেও পাড়ার মোড়ে ছেলেদের জটলা ছিল। রকগুলো ভরা ছিল, কলতলা পরিপূর্ণ ছিল। দু-পাঁচ মিনিটের মধ্যে হঠাৎ কী হল?

আমি আর আমার বর তরুণ আমাদের শিশুকন্যাকে নিয়ে তখন উত্তর কলকাতায় আমার বাবা-মায়ের বাড়িতে থাকি। বাবা-মা, তরুণ কেউই সেদিন বাড়ি নেই। বাড়িতে শুধু আমি আর আমার ছোট্ট মেয়ে। মা গিয়েছেন তাঁর ভাইয়ের কাছে, ভাইফোঁটায় মায়ের যাওয়া হয়নি সেবার কী একটা কারণে। মামাও আসতে পারেননি শরীর খারাপ ছিল বলে। তাই ভাইফোঁটার দিন পাঁচেক পর মা গিয়েছেন আমার মামার বাড়িতে। অবশ্য আমার মামাবাড়ি আমাদের বাড়ির খুব কাছেই। বাবা গার্ডেনরিচে তাঁর অফিসে বেরিয়ে গিয়েছেন সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ। তরুণও ডালহৌসিতে ওর চাকুরিস্থলের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে গিয়েছে সকাল সকাল।

তখন আমাদের বাড়িতে টেলিফোন নেই। সারা পাড়াতে মাত্র একটাই টেলিফোন আছে আমাদের উলটোদিকের ডাক্তারবাবুর বাড়িতে। টিভিতে খবর হবে আধঘণ্টার জন্যে; একবার ছ'টার সময় আর একবার ন'টার সময়। তবে বেতারে অবশ্য বেশ ঘনঘন খবর সম্প্রচার করে অল ইন্ডিয়া রেডিও।

আমার কি মনের ভুল? আমার কেন মনে হচ্ছে আজকে পাড়াটা যেন অন্যদিনের মতো স্বাভাবিক ছন্দে চলছে না। মনে হচ্ছে পাড়াটা যেন থমথম করছে।

ঘরে জামাকাপড় পাট করছিলাম এমন সময় জোরে বেল বাজল। দরজায় তরুণ। ভীষণ ঘামছে ও। আমি বললাম, 'কী হল? শরীর ঠিক আছে তো? অফিসে গেলে না?'

তরুণ তাড়াতাড়ি সদর দরজাটা বন্ধ করে দিল। 'পুলিশের জিপে চড়ে ফিরলাম। রাস্তায় বাস-ট্রাম-ট্যাক্সি কিছু নেই। '

আমি বিস্মিত। 'কেন? কিছুক্ষণ ধরে পাড়াটাও দেখছি কেমন চুপচাপ? কোনও গণ্ডগোল বেঁধেছে নাকি আজ কলকাতায়? ইস্, বাবা-মা বাইরে রয়েছে। এমনিতে কী হয়েছে কী?'

তরুণ খুবই ক্লান্ত। মনে হচ্ছে ফিরতে খুব কষ্ট হয়েছে ওর। বলল, 'তুমি এখনও শোনোনি? সে কি? রেডিও খোলোনি নাকি? ইন্দিরা গান্ধীকে গুলি করেছে। আজ সকাল সাড়ে ন'টা নাগাদ। ওঁরই দেহরক্ষী।'

আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। 'বেঁচে আছে?'

তরুণ জানে না। 'রাস্তায় কেউ বলতে পারল না। লোকে বলছে নাকি হসপিটালে নিয়ে গিয়েছে। অপারেশন চলছে। রেডিও খোলো এখুনি।'

আমি কাঁপা হাতে রেডিও খুলতে খুলতে বললাম, 'কিন্তু এখন তো রেডিওতে খবর হয় না। এখন সিনেমার গান হয়।'

না, সিনেমার গান হচ্ছে না রেডিওতে। খুব ধীর স্বরে দিল্লি থেকে অল ইন্ডিয়া রেডিও বাজাচ্ছে 'সারে জাঁহাসে আচ্ছা... হিন্দোস্তান হামারা... হাম বুল বলে হ্যায় ইসকে...

.. ইয়ে গুলিসতা হামারা...' কী করুণ সুর গানটার। সারা পাড়ার সব বাড়ির রেডিওতে বাজছে গানটা। আকাশবাণীতে চলে গেলাম চ্যানেল সার্ফ করে। সেখানে বাজছে 'ও আমার দেশের মাটি / তোমার পরে ঠেকাই মাথা।' গান বেজে চলেছে বাংলা-হিন্দি-ইংরেজি চ্যানেলে, ঢাকার বেতার বাজাচ্ছে 'আমার সোনার বাংলা... আমি তোমায় ভালবাসি..'

বিবিসি প্রথম বলল, 'প্রাইম মিনিস্টার অব ইন্ডিয়া ইন্দিরা গান্ধী হ্যাড শট টু ডেথ বাই হার শিখস বডিগার্ডস।' যদি বিবিসি-র খবর ঠিক হয় তাহলে নিজের শিখ দেহরক্ষীর গুলিতে প্রাণ হারিয়েছেন ইন্দিরা গান্ধী।

নিজেরও আসছে। ইন্দিরা গান্ধীর মতো প্রধানমন্ত্রীকে ভারতের বড়ই দরকার ছিল এখন। মিছিলে মিছিলে ছয়লাপ পাড়া। পাড়া ঢেকে গিয়েছে তেরঙ্গায়। মিছিল কাঁদতে কাঁদতে চলেছে। আবার মিছিলের ভেতর থেকে কত লোক গর্জন করে উঠছে। 'মাকে মেরে তোরা পালাবি ভেবেছিস? মাকে মেরে পালিয়ে যেতে দিচ্ছি না দিচ্ছি না। যবতক সুরজ চাঁদ রহেগা... ইন্দিরাজি কা নাম রহেগা... বন্দেমাতরম।' ক্রমশ হিংস্র হয়ে উঠছে অশ্রুসিক্ত মিছিল।

আমাদের পাড়ায় এক পঞ্জাবি মহিলার জামাকাপড় তৈরির ছোট দোকান ছিল। দোকান বন্ধ করে মহিলা কোথাও আত্মগোপন করেছেন একটু আগে। মিছিল থেকে হঠাৎ চার-পাঁচজন ছেলে বড় বড় থান ইঁট তুলে ছুঁড়তে লাগল পঞ্জাবি মহিলার সেই বন্ধ দোকানের সামনে। লাঠি-বাঁশ দিয়ে তারা ভেঙে ফেলল দোকানের দরজা। দোকানের ভেতর যেটুকু যা ছিল সব লুঠ চলল। চলল ভাঙচুর। পুলিশের গাড়ি এসে পড়ল হু হু করে। পুলিশ ছুঁড়তে লাগল জলকামান। টিয়ার গ্যাস।

বাবা অফিসেই থেকে যাবেন আজকে। সামনের বাড়ির ডাক্তারবাবুকে ফোন করে বাবা জানিয়েছেন অফিস থেকে কেউ বেরোতে সাহস করছে না। বাবাদের অফিসে বেশ কিছু শিখও

বন্ধ। পুলিশের টহল চলছে সারা শহর জুড়ে। মিছিল বেরোচ্ছে আর সমানে মারধোর চলছে শহরে। শহরের বুকে চার-পাঁচটা খুন ইতিমধ্যেই ঘটে গিয়েছে।

জ্যোতিবাবু দিল্লিতে ছিলেন। বিকেল সাড়ে পাঁচটায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে অফিসিয়ালি ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা হবার সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতিবাবু ঘোষণা করলেন কার্ফু।

পাড়ায় পাড়ায় পাড়ার ছেলেরা ঘিরে রইল শিখদের বাড়িগুলি যাতে শিখদের কেউ আক্রমণ না করতে পারে।

কলকাতা সেদিন গ্রন্থসাহেবকে বুক দিয়ে আগলে দাঁড়াল।

শহরে কোথাও কোনও মিছিল করতে দেওয়া হল না, কারণ মিছিলগুলো থেকেই আগ্রাসী বোকা আবেগের বাঁধ ভেঙে হিংসা ছড়িয়ে পড়ছিল। রাইফেল নিয়ে শহরের রাস্তা জুড়ে শুধু ঘুরল প্রহরীরা। ভারতের অন্যান্য শহরে যখন চলল ভয়ানক শিখ নিধন, কলকাতায় বড় ধরনের শিখ নিধন আর দাঙ্গা সেদিন রুখে দেওয়া গেল দক্ষতার সঙ্গে।

শহরের ফাঁকা রাস্তায় পড়ে রইল বিক্ষিপ্ত ইঁটের টুকরো। দু-একটি প্রাণ খসে গেল শহর থেকে। সারা পাড়া থমথম করল। শহরের ঘর

মা হেঁটে হেঁটে বাড়ি ফিরে আসতে পেরেছেন আমার মামার বাড়ি খুব কাছে বলে। কিন্তু বাবা? গার্ডেনরিচ থেকে বাবা বাড়ি ফিরবেন কী করে? শহরে পুড়তে শুরু করেছে বাস, শ্যামবাজারে একজন পঞ্জাবি ট্যাক্সি চালককে ইতিমধ্যেই ট্যাক্সির মধ্যে বন্ধ করে জীবন্ত পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। পাড়ার একটি ছেলে এখুনি এই খবর দিল। পাড়ায় বেরিয়েছে মিছিল। মিছিলের অনেক ছেলেমেয়ে হাঁটতে হাঁটতেই কান্নায় ভেঙে পড়ছেন। চোখে জল অবশ্য আমার আশ্রয় নিয়েছেন। ওঁদের অফিসে রাখতে ভয় পাচ্ছেন সকলে। তবু কেন্দ্রীয় সরকারের অফিসে চট করে আগুন লাগানো মুশকিল বলে শেষ পর্যন্ত শিখদের থাকতে দেওয়া গেছে। এসব বাবা আমাদের ডাক্তারবাবুকে ফোনে জানিয়েছেন। তরুণ বলল, 'যাক, অফিসে থেকে গিয়ে ভালো করেছেন। রাস্তায় আগুন জ্বলছে। বাস-ট্রাম পুড়ছে। মানুষ উন্মত্ত হয়ে ইঁট ছুঁড়ছে।'

পাড়ার অনেকেই বাড়ি ফিরল না সেদিন। যে যাঁর অফিসে থেকে গিয়েছেন। বাজার-হাট সব গেরস্তি কাঁদল আকাশবাণী খুলে। শহরটা যতটা বাঙালির ততটাই যে শিখেরও— সেটা সেদিন দেখল শহরবাসী। বাঙালি, শিখ, গুজরাতি, পাঠান, কাবুলি সকলে মিলে সেদিন সকলের হাত ধরে রইল শক্ত করে। গীতবিতানের শহর সেদিন গ্রন্থসাহেবকে জড়িয়ে ধরল গভীর ভালোবাসায়। তীব্র শোকের ভেতর, কার্ফুর ভেতর, রাইফেল নিয়ে প্রহরীর ঠান্ডা টহলদারির ভিতর এই তিলোত্তমা স্তব্ধ হয়ে রইল কয়েকদিন।

কলকাতা

যুগশঙ্খ SUPPLI

সোমবার, ১০ জুলাই ২০১৭

মাল্টিপ্লেক্স না ভালো সিনেমা, কে মেটাল টলিউডের সংকট?

সংযুক্তা ঘোষ

বোরিং সেভেন্টিস। পর্দার ওপারে ততক্ষণে ঝলসে উঠেছেন উত্তম-সুচিত্রা। সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ঝড় তুলেছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, দিলীপ কুমার, মাধবী মুখোপাধ্যায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, তনুজা প্রমুখ তাবড় তাবড় কলাকুশলী। আর বোম্বেতে অমিতাভ-রেখা, রাজেশ খান্না-শর্মিলা ঠাকুর, ধর্মেন্দ্র-হেমা মালিনী, নাসিরুদ্দিন-শাবানা আজমি এঁরা সব একের পর এক হিট নম্বর দিয়েই চলেছেন। এঁদের সকলের অস্ত্র একটাই— অভিনয়। আর সেই অভিনয়ের উপর ভর করেই তৈরি করা যাবতীয় গল্প, যথাযথ লোকেশন, লাইট-ক্যামেরা-সাউন্ড-অ্যাকশন সবকিছুর পারফেক্ট ব্লেন্ডে বেরিয়ে আসা টানটান এক ক্লাইম্যাক্স— যার নিষ্পত্তি বক্স অফিস হাউসফুল না হয়ে যায় কোথায়! এঁদের রক্তে, শ্বাস-প্রশ্বাসে, দৈনন্দিন জীবনযাপনে সবেতেই মিশে আছে সিনেমা। অভিনয় তাঁদের পেশা কাম নেশা, যাতে যুগ যুগ ধরে মজে রয়েছে আপামর জনসাধারণ। ব্যতিক্রম নন বাঙালিরাও। আজ থেকে তিন-চার দশক আগেও চলচ্চিত্র নিয়ে বাঙালিদের মধ্যে ঠিক যতখানি উন্মাদনা ছিল, আজও ঠিক ততখানিই আছে। সেকালে সিনেমা দেখতে যাওয়ার মধ্যে একটা রোমাঞ্চকর ব্যাপার ছিল। তার প্রস্তুতিই আলাদা মাপের। ছোটবেলায় দেখতাম সিনেমাহলে কোনও নতুন ছায়াছবি এলেই মা-মাসি-কাকি-পিসিরা পরিবারের কাউকে না কাউকে দিয়ে ঠিক কায়দা করে আগে থেকে টিকিট কাটিয়ে রাখতেন। কারণ দিনের দিন লাইন দিয়ে টিকিট কাটতে গেলে না-পাওয়ার সম্ভাবনাই যে বেশি। তারপর নির্দিষ্ট দিনে সকলে দল বেঁধে চললেন সিনেমাহলে। উফ সে কী উন্মাদনা! ছোট্ট একফালি সিনেমাহল, মাথার উপর দুটো কী তিনটে ঘড়ঘড় করে পাখা ঘুরছে। থেকে থেকেই মশা-ছারপোকা আরও না জানি কী কী কামড়াচ্ছে, কাঠের শক্ত চেয়ারে বসে বসে পিঠ-কোমর ধরে যাওয়ার জোগাড়, তবু ভাটা পড়ছে না তাদের হুজুগে। বাংলা হোক কী হিন্দি, নায়ক-নায়িকার প্রত্যেকটা অভিব্যক্তি আর সংলাপের সঙ্গে কোনও রকমের আপস করতে নারাজ তারা। আর তাছাড়া পর্দার ওপারের সব জলজ্যান্ত খ্যাতনামা ব্যক্তিত্ব এসব ছোটখাটো অসুবিধে তাদের টের পেতে দিলে তো! স্নায়ু তখন টানটান। শিরায়-উপশিরায় খেলে যাচ্ছে মাতাল করা সংলাপ। ধমনির মধ্যে তোলপাড় চলছে নায়ক-নায়িকার মিলনকে ঘিরে। চোখের পাতা ভিজে গাল বেয়ে গড়িয়ে এসেছে জল- স্পিরিটটাই তো এমন! সেখান ঘাম হচ্ছে না কাঁপুনি দিচ্ছে, মশা কামড়াচ্ছে না আরশোলা, এসবের দিকে মন দেওয়ার ফুরসত কোথায়? চোখের সামনে জীবন্ত সব চরিত্রগুলি ততক্ষণে কোনও এক অদৃশ্য মায়ার বাঁধনে বেঁধে ফেলেছে দর্শকদের। জড়িয়ে ফেলেছে নিজেদের সুখ-দুঃখ, আপদ-বিপদের সঙ্গে। হাসাচ্ছে, কাঁদাচ্ছে, এক কথায় নিবিষ্ট করে রেখেছে নিজেদের মধ্যে। হ্যাঁ, এরই নাম তো সিনেমা।

কিন্তু একটা সময়ের পর সেই উন্মাদনা ক্রমশই কোথায় যেন হারিয়ে গেল। সিনেমার সেই নায়ক-নায়িকারা ক্রমশ বৃদ্ধ হতে লাগলেন। বদলে হাল ধরার জন্য যাদের আত্মপ্রকাশ ঘটল তাঁরা সেই জনপ্রিয়তা পেলেন না। শুধুমাত্র সিনেমা তৈরি হল। বাণিজ্যও কিছুটা হল বটে। কিন্তু সেই ইমোশনটা কোথায় যেন হারিয়ে গেল। সময়ের

চাহিদার সাথে সাথেই সেই সিনেমাহলগুলি ক্রমশ হারিয়ে গেল। এভাবে একসময় কার্যত সংকটের মধ্যে পড়ে গেল সিনেমা শিল্প। বিশেষত টলিউড। উত্তম-সৌমিত্রর পর সেভাবে বাংলা সিনেমাতে কাউকে দেখা গেল না। গল্প, স্ক্রিপ্ট, অভিনেতা-অভিনেত্রী পরিচালক সবকিছুরই অভাব দেখা গেল। এক কথায় বলা যায় এক মোনোটোনাস সময় চলতে থাকল। হলমুখী দর্শক ক্রমশ ঘরমুখী হতে শুরু করল। সিনেমাহল উঠে যেতে থাকল। এর পিছনে নানা কারণ থাকলেও ভালো সিনেমার অভাব কিন্তু অন্যতম কারণ। টলিউডকে ধরে রাখলেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, রঞ্জিত মল্লিকের মতো কড়গোনা কয়েকজন। অভিষেক, ভিক্টর, তাপস পাল অনেক সিনেমা বানালেও সাফল্যের পরিমাণ খুবই কম। সেই মোনোটোনাস সময় কাটতে প্রায় এক দশকের বেশি সময় কেটে গেল। সময়ের চাহিদা মেনে কাহিনি, স্ক্রিপ্ট, লোকেশন পরিবর্তন হল। জিৎ, দেব, জিশু, আবির, রুদ্রনীল, কোয়েল, শ্রাবন্তী, শুভশ্রী, নুসরত-এর হাত ধরে যেমন দর্শকদের কাছে নতুন কিছু মুখ উঠে এল। তেমনই সৃজিত মুখোপাধ্যায়, কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়, সন্দীপ রায়, রাজ চক্রবর্তীর হাত ধরে কিছু ভালো সিনেমা দেখা গেল। কিছু সিনেমা হয়তো বাণিজ্যিকভাবে সফল হল না। কিন্তু পরিবর্তনের জন্য তা অনুঘটকের কাজ করল। 'সাথী', 'মিনিস্টার ফাটাকেষ্ট', 'এমএলএ ফাটাকেষ্ট' যেমন হিট করল, তেমনই পাল্লা দিয়ে বেশ কিছু গোয়েন্দা গল্প যেমন 'ব্যোমকেশ', 'ফেলুদা', 'মিশর রহস্য' সিনেমাগুলি দর্শকদের ফের সিনেমা হলে ফিরিয়ে আনল। মোনোটোনাস প্রেম-বিরহ থেকে বেরিয়ে এসে দর্শক অন্য ধরনের বাংলা ছবির স্বাদ পেতে শুরু করলেন। সেই সাফল্যই ক্রমশ সিনেমাহলগুলিকে পুনরুজ্জীবন দিল। সেই সাফল্য এবং সময়ের চাহিদা মেনে তৈরি হতে শুরু করল মাল্টিপ্লেক্স।

ফের দর্শক কাঁদলেন, হাসলেন, সিনেমার সাথে নিজেকে রিলেট করা শুরু করলেন। মা-জ্যেঠিমারা আজ আর গুমোট, স্যাঁতস্যাতে, পোকা-মাকড়যুক্ত একক পর্দার সিনেমাহলে যান না, যান মাল্টিপ্লেক্সে। এই মাল্টিপ্লেক্স দিনে দিনে এতখানি সর্বজনীন হয়ে উঠেছে যে একক পর্দা থিয়েটারের অবলুপ্তির দিনক্ষণ আমরা বেমালুম ভুলেই গেছি। আমাদের শহুরে দৃশ্যপটের মধ্যে কখন যে একেবারে খাপ খেয়ে গেল বিলাসবহুল মাল্টিপ্লেক্সগুলি, তা যেন বুঝেই ওঠা গেল না। মানুষ এখন সিনেমা আর সিনেমাহল— দুইয়েই মুগ্ধ, সন্তুষ্ট। অর্থাৎ কেনাকাটা, খাওয়াদাওয়া, সিনেমা দেখা সবটা একই ছাদের তলায়। সিনেমা নিয়ে বাছবিচার তো মানুষের চিরকালীন ধর্ম। সব সিনেমা সকলের ভালো লাগার কথা নয়। প্রত্যেকের পছন্দ, রুচি ও উৎসাহ ভিন্ন। মাল্টিপ্লেক্স ঠিক এখানেই এক ধাপ এগিয়ে জিতে নিয়েছে মানুষের মন। একই সঙ্গে একাধিক পর্দায় আলাদা আলাদা সিনেমা দেখানোর সুবিধে এনে দিয়েছে সে। একই দিনে তিনটে ভিন্ন ধারার সিনেমা মুক্তি পেলে মাল্টিপ্লেক্স তা মানুষের সামনে মেলে ধরছে তিনটে পৃথক স্ক্রিনে। ফলে যাঁর যেই ধরনের সিনেমা পছন্দ তিনি সেই সিনেমার টিকিট কেটে নির্দিষ্ট হলে ঢুকে পড়ছেন। নম্বর মিলিয়ে দখল করে নিচ্ছেন নির্ধারিত আরামকেদারা। বাতানুকূল এই সিনেমাহল বেজায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। একটা শো শেষ হলে গোটা হল সাফাই করে ফের পরের শো'য়ের জন্য ভর্তি করা হয়। কাজেই পোকা-মাকড় তো দূর, ঠান্ডা হলঘরে একটা মশা-মাছিরও ঢোকার অনুমতি নেই। চোখের সামনে ঝকঝকে জায়ান্ট থ্রি-ডি স্ক্রিন, ডলবি-ডিজিটাল সাউন্ড সিস্টেমে গমগম করছে চারধার, পিছনে এলিয়ে দেওয়া নরম গদির চেয়ার— সব মিলিয়ে সিনেমা-প্রেমিকদের তৃপ্তিটাকে একটা অন্য মাত্রায় নিয়ে যেতে পেরেছে আজকের সিনেমা ও মাল্টিপ্লেক্স। সিংগল স্ক্রিন সিনেমা হলের সাথে যার আর আজ কোনও তুলনাই চলে না। প্রযুক্তির সাথে সাথে দর্শকের পছন্দও গুরুত্ব পেতে শুরু করাতেই এই সাফল্য বলে মনে করা হয়।

দিনে দিনে একটু একটু করে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে মা-জ্যেঠিমাদের একক পর্দার থিয়েটারগুলি। উল্লেখযোগ্য কয়েকটির মধ্যে প্রথমেই যার কথা বলতে হয় তা হল ধর্মতলা চত্বরের আইকনিক 'মেট্রো সিনেমা'। যা ১৯৩৫ সালে উদ্বোধন হয়ে প্রায় আট দশক ধরে চলচ্চিত্র পরিচালনার পর আত্মসমর্পণ করে ২০১৪ সালে। শোনা যাচ্ছে, সেই জায়গাটির দখল নিয়ে আইনক্স লেইজার লিমিটেড খুব শিগগিরিই গড়ে তুলতে চলেছে বিলাসবহুল শপিংমল কাম মাল্টিপ্লেক্স। আরেকটি অবলুপ্ত থিয়েটার হল নিউ মার্কেটের হুমায়ুন প্যালেসে অবস্থিত 'লাইটহাউস'। ১৯৩৪ সালে চালু হওয়া এই হলটিতে মূলত হলিউডের ছবিরই স্ক্রিনিং হতো। পরে যদিও আস্তে আস্তে তা বলিউডকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে। ২০০২ সালে কিছু আইনি জটিলতাকে কেন্দ্র করে সিনেমাহলের নীচ তলায় খুলে যায় সিটিমার্টের শোরুম যা পরবর্তীকালে পুরোটাই দখল করে বসে। বন্ধ হয়ে যাওয়া আরেকটি সিনেমাহলের নাম লেনিন সরণির 'জ্যোতি'। '৭০-এর দশকে ৭০ মিমি-এর ছবি চালিয়ে যা সাড়া ফেলে দিয়েছিল গোটা শহরে। তৎকালীন গুণমান অনুযায়ী স্ক্রিন, স্টিরিওফোনিক সাউন্ড ও আরামদায়ক সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট হলেও শেষ পর্যন্ত মাল্টিপ্লেক্সের কাছে তাকেও মাথা নোয়াতে হয় ২০০৮ সালে। লিন্ডসে স্ট্রিটে নিউ মার্কেটের প্রবেশ পথের ঠিক উলটোদিকের 'গ্লোব'-এর কথা তো আমাদের কারওরই অজানা নয়। শতাব্দীর প্রাচীনতম ঐতিহ্যবাহী এই হলটি হলিউড স্ক্রিনিং-এর জন্য রূপান্তরিত হওয়ার আগে প্রাথমিকভাবে একটি অপেরা হাউস হিসেবে নির্মিত হয়েছিল। পরে সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্র প্রদর্শন করিয়ে তার ব্যতিক্রম ঘটানো হয়। এক সময়ের কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবের সাক্ষীও হয়ে থেকে গিয়েছে প্রাচীন এই হলঘরটি। বর্তমান পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে করতে ২০০৬ সালে এটিও বাকিগুলোর মতন হাল ছেড়ে দেয়। একই দশা বেলিয়াঘাটার 'আলোছায়া'রও যা আজ বহুতলে পরিণত হওয়ার দিন গুনছে। 'ওরিয়েন্ট' ও 'ম্যাজেস্টিক' হতে চলেছে ব্যাঙ্কোয়েট হল ও হোটেল। কলকাতার ফিল্ম সোসাইটির যুগ্ম সচিব সজল দত্ত জানান, 'পশ্চিমবঙ্গে একসময়ে প্রায় ৫০০টি একক পর্দার থিয়েটার ছিল যার অর্ধেকেরও বেশি আজ বন্ধ হয়ে গিয়েছে।' কলকাতার মধ্যে হাতেগোনা কয়েকটি মাত্র টিকে আছে যেমন 'রক্সি', 'নিউ এম্পায়ার', 'প্যারাডাইস', 'অজন্তা', 'মিত্রা', 'জগৎ', 'প্রিয়া' ইত্যাদি। সময়ের চাহিদা মেনে কিছু হারিয়ে গেলেও আশার কথা একটাই বাংলায় আবার ভালো সিনেমা তৈরি হচ্ছে। মানুষ ইন্টারনেটের সাথে সাথে সিনেমাহলে এসেও সিনেমা দেখছেন। এভাবে ধারাবাহিকভাবে চললে বাংলা সিনেমা ফের তার পুরনো গৌরব ফিরে পাবে বলেই আশা করা যায়।

কলকাতা
যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ১০ জুলাই ২০১৭

জুয়া কালচার

বুদ্ধদেব হালদার

শকুনির পাশা খেলার কথা মনে পড়ে? ঘুঁটিতে গুবড়ে পোকা ভরে যে জোচ্চুরির নয়া কৌশল তিনি ব্যবহার করতেন, সেই স্কিল সময়ের সাথে সাথে কীভাবে পালটে আসে তা কলকাতার মুহম্মদ খান, গোপাল মুখোপাধ্যায়, বিকে বা বব দাসের দিকে চোখ ফেরালেই বুঝতে পারি আমরা। এরা সব আশির দশকের বিখ্যাত জুয়াড়ি। এই মহানগরের বুকে দাপটের সঙ্গে রাজত্ব করেছে এক সময়। সে সময়ের বহু নামী ক্লাব দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার ভয়ে এদের জুয়ার আড্ডায় কোনওরকমভাবেই অংশগ্রহণ করতে দিত না। এতটাই তাদের সাফল্যের সুনাম আছে। অবশ্য জুয়া খেলা নতুন কিছু নয়। এ তো সেই বেদের আমল থেকেই চলে আসছে। তবে তার প্রয়োগ ও প্রকরণ পালটে গেছে যুগের নিরিখে। আর কলকাতার বাজারে এর রমরমা চাহিদা ছোট-বড় সমস্ত ব্যবসায়ীর কাছে আজও হেভিওয়েট প্রোফিটের সবচেয়ে সহজ ও সস্তা উপায়।

উনিশ শতকের তিনের দশকে বাঙালির চোখ থমকে গিয়েছিল বণিক সম্প্রদায়ের কাঁচা টাকায়। অবশ্য আঠারো শতকের দালাল সম্প্রদায়ের প্রভাব-প্রতিপত্তিও এর পিছনে যথেষ্ট রসদ জুগিয়েছিল। ব্যবসা-বাণিজ্য বা চাকরি-বাকরিকে পাশ কাটিয়ে উনিশ শতকের কলকাতাবাসীর অনেকেই অসৎ উপায়ে বড়লোক হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন। কেউ কেউ সে স্বপ্ন সফল করতেও পেরেছিলেন, এও ঠিক। আবার বেশিরভাগ মানুষই লোভের বশে চিরকালীন ক্ষয়ে শেষ হয়ে গেছেন। এটাও সত্যি।

সেই সময়ের নগর কলকাতার উন্নয়ন ঘটেছে এবং সেই উন্নয়নের বেশিরভাগটাই আসলে জুয়ার টাকাতে হয়েছিল। লর্ড ওয়েলেসলি এর সূত্রপাত করেছিলেন। মূলত জুয়া খেলার উপর সরকারি সিলমোহর তাঁর চেষ্টাতেই সম্ভব হয়েছিল। সময়টা ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দ। এই সময়ের সরকারি স্বীকৃতিতে লটারির টাকায় তৎকালীন উত্তর ও মধ্য কলকাতার উন্নয়নের কাজ শুরু হয়। কলেজ স্কোয়ার, ওয়েলিংটন স্ট্রিট, হেস্টিংস রোড এসব অঞ্চলের রাস্তাঘাট ও আলোকসজ্জায় আমূল পরিবর্তন ঘটে। ফলে ওইসব অঞ্চলে জমির দাম কাঠা প্রতি ২৫ টাকা থেকে বেড়ে ৫০০ টাকা পর্যন্ত হয়ে যায়। ধর্মতলা, বউবাজার, বড়বাজার এসব জায়গা ধীরে ধীরে বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে গুছিয়ে উঠতে শুরু করে। জুয়া খেলায় হেরে সর্বস্বান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকলেও, সে সময়ের কলকাতাবাসী তা থেকে পিছপা হতেন না। হয় এসপার নয় ওসপার। এরকম একটা মনোভাব। শুধু যে সে-সময়ের দেওয়ান বা সেরেস্তাদার বা কতিপয় চিহ্নিত মানুষ এসবে হাত পাকিয়েছিলেন তা নয়। বাঙালিদের একটা খুব বড় অংশই উনিশ শতকের কলকাতায় জুয়া সাম্রাজ্যে মেতে উঠেছিল। প্রিন্স দ্বারকানাথেরও এ-বিষয়ে যথেষ্ট দুর্নাম ছিল। ১৮৩০ সালে কালীগ্রাম বা ১৮৩৪-এ সাহজাদপুর তিনি এভাবেই নিজের কুক্ষিগত করেছিলেন। ১৮৬২ সালে প্রকাশিত কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা' বইটিতে বিভিন্ন চরিত্র ও ঘটনার মধ্যে দিয়ে সমসাময়িক সময়ে জুয়া খেলার প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিষয়ে উল্লেখ করা আছে। জহরলাল ধর-এর 'সচিত্র কলকাতা রহস্য' (১৮৯৬) তেও এ-বিষয়ে লেখা হয়েছে প্রচুর। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। কেদারনাথ দত্তের 'সচিত্র গুলজার নগর'(১৮৭১)-এ তিনি লিখছেন, '...ওই গলি প্রকৃত কুচনীপাড়া, তথায় বোধ হয় ভদ্রলোকের বসতী নাই, রাজ্যের জুআচোর, হপ্তকলুমে, খুঁটআঁখুরে, জালখোতে, বর্ব্বলে আড্ডা গেড়েছে, হেটোরাঁড়ে চারদিক গিজগিজ কচ্চে ...।'

সেসময়ের অনেক খেলাই এখনও কোনওরকম রদবদল ছাড়াই চলে আসছে, যেমন— 'তিন তাস'। যদিও উনিশ শতকে ঘুড়ির খেলা, মুরগি লড়াই, বরখা, জলের বাজি বা চিৎপট খুবই উল্লেখযোগ্য খেলা। ঘুড়ির জুয়ার খেলাটি প্রবর্তন করেছিলেন সম্রাট ওয়াজেদ আলি শাহ। ১৮৫৪-এর মাঝামাঝি সময়ে তিনি কলকাতায় ঘুড়ি-সুতোর নতুন খেলা শুরু করলেন। কলকাতার মেটিয়াবুরুজ এলাকাকে সেই সময় তিনি লখনউ-এর আদলে গড়ে তুলেছিলেন। আবার জলের বাজি খেলাটাও খুব ইন্টারেস্টিং। যেদিন আকাশে মেঘ জমবে সেদিন দু'পক্ষের মধ্যে শুরু জুয়ার লড়াই। মোটা অঙ্কের টাকা লাগানো হয় এতে। একদল বৃষ্টির পক্ষে, অপরদল বিপক্ষে। আবার শুধুমাত্র দু'জন ব্যক্তির মধ্যেও এ খেলা হতে পারে। এটা নেশার মতন পেয়ে বসে দু'দলকেই।

এর ছাঁচেই আমাদের এখানকার সাট্টা খেলা প্রচলিত। এই খেলার মূল বিষয় 'পাত্তি' কে কেন্দ্র করে। একটি প্যাডের ছোট নীল কাগজে কাস্টমার নিজের পছন্দমতো একটি নম্বর বেছে নেবেন। ধরা যাক ৮২৩ সংখ্যা কেউ নিজের জন্য বাছাই করল। সেক্ষেত্রে এর যোগফল ৮ + ২ + ৩ = '১৩'-র শেষের সংখ্যা '৩'-ই হল সেই জুয়াড়ির ভাগ্য নিয়ন্ত্রক সংখ্যা। একটি বিশাল অঞ্চলকে হাতে রাখেন একজন 'বুকি'। তাঁর আন্ডারে বিভিন্ন এলাকাকে কন্ট্রোল করার জন্য থাকে এজেন্ট। এবং এই এজেন্টদের তলায় থাকে 'পেনসিলার' যাদের আমরা বিভিন্ন চায়ের দোকান, পাড়ার ঠেক বা ক্লাবঘরেও দেখতে পেয়ে যাই। এই খেলায় জিতে যাওয়া টাকার পেমেন্ট-এর ক্যালকুলেশনও অদ্ভুত ধরনের। এক টাকায় জেতা অর্থের পরিমাণ দশ টাকা থেকে শুরু করে পনেরো হাজার কিংবা তার বেশিও হতে পারে। নির্ভর করছে গেমের কন্ডিশনের উপর। এখন তো আবার হুবহু সাট্টার মতোই সরকারি ট্যাক্স দিয়ে শুরু হয়েছে 'প্লে উইন', 'লাক্সমি', 'সুপার লোটো' প্রভৃতি খেলা। তবে এখানে কোনও বুকি বা পেনসিলারের দরকার পড়ে না। কিন্তু কথা হল সরকারি উদ্যোগে হোক বা

কলকাতা ছেড়ে পালিয়ে যান। সেসময় অনেকটাই ঝিমিয়ে আসে এই জুয়া কালচার। অবশ্য এখন আবার এটা বেশ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। বিভিন্নপ্রকার সাট্টার মধ্যে 'ভূতনাথ', 'কলাবাগান', 'ফটাফট' প্রভৃতি বিখ্যাত।

তাসের জুয়ায় 'রামি', 'ফিশ', 'কল ব্রে' প্রভৃতি খেলায় আজও পাড়ার ক্লাবঘর বা মহানগরের বিভিন্ন ঠেক-এ প্রতি রাতে লক্ষ লক্ষ টাকা অবলীলায় হাতবদল হয়ে যায়। সিন আর ব্লাইন্ড— মূলত এই দুই পদ্ধতিতেই কার্ড পিছু টাকা বাজি রেখে এই খেলায় দান গোনা হয়। এই খেলার জন্য অনেক পেশাদার জুয়ার আড্ডা বা 'ফার' শহরের বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য জায়গাতেই আছে। কলকাতার জুয়া কালচারে আজকের সময়ে দাঁড়িয়ে যে সমস্ত খেলার চাহিদা মার্কেটে মারাত্মক তাদের মধ্যে রেসকোর্স, পিংক স্ট্রিকার বা 'রেড নাট' -এর নাম উল্লেখ করা যায়।

একালের সাহিত্যেও উঠে এসেছে এই মারণ খেলার অসহ্য পরিণাম। এই সময়ের বিশিষ্ট কবি সৌম্যজিৎ আচার্যের একটি কবিতায় পাওয়া যায়, 'জীবনটা জুয়াগাছ ...স্বপ্ন না সিঁড়ি সে জানে না ...থাকবে না পিছলোবে সে জানে না...।' বড়লোক হওয়ার স্বপ্নে বিভোর হয়ে

লুডো ঠিকই...তবে এভাবেও এখন কলকাতায় জুয়া খেলার আসর বসে

এই একুশ সেঞ্চুরিতেও খুব একটা হেরফের হয়নি এর। কলকাতার বড়বাজার, কোলে মার্কেট, বিডন স্ট্রিট, শোভাবাজার, পার্ক সার্কাস, যোধপুর পার্ক এসব অঞ্চলে এখনও রমরমিয়ে চলছে এই মারণ খেলা। বলাই বাহুল্য বেশ বহাল তবিয়তেই অক্ষত আছে কলকাতার জুয়া কালচার। সত্তরের দশকে এর ব্যাপ্তি ও প্রসার হকচকিয়ে দেখার মতন ছিল। 'সাট্টা' র কথা কে না জানে। একমাত্র বড়বাজার অঞ্চলেই আজও শুধুমাত্র 'সাট্টা' খেলাতেই দিনে প্রায় তিরিশ-বত্রিশ লক্ষ টাকার লেনদেন হয় বলে জানা যায়। আমেরিকার 'নম্বর গেম' ব্যক্তিগত প্রভাবেই হোক জুয়া খেলা জীবনের শেষ সম্বলটুকুকেও হারিয়ে ফেলার পথ সুগম করে তোলে। এই সাট্টার মতো ভয়ানক জুয়ার নেশা কত মানুষকে যে আত্মহত্যায় বাধ্য করেছে তার কোনও হিসাব নেই। এমনকী নিজের ঘরের স্ত্রীকেও পরপুরুষের কাছে একরাত বন্ধক রাখার মতন ঘটনা খুব একটা বিরল নয়। অবশ্য উনিশশো তিরানব্বই সালে বউবাজার বোম্ব ব্লাস্টিংয়ে কলকাতার জুয়া সাম্রাজ্যে ধস নেমেছিল। ফলে বড়বাজার, কলেজ স্ট্রিট, শোভাবাজার, বউবাজার, আনোয়ার শাহ রোড প্রভৃতি অঞ্চলের এজেন্টরা রাতারাতি জুয়ার খাতায় নাম লেখাবার লোক যেমন আগেও ছিল, এখনও আছে। অবশ্য মহাভারতের পাশা খেলার ট্রেন্ডটাকেও তো বজায় রাখতে হবে না কি? এসব খেলার মধ্যেও একটা প্রাচীন সংস্কৃতি আছে, যাকে অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই। শুধু ভালোগুলোকে নেব আর অপেক্ষাকৃত রিস্কি টার্মগুলোকে ইগনোর করব তা তো হয় না! বরং এভাবেই কলকাতা থাকুক কলকাতাতেই। তবে কথায় আছে নিজের ভালো পাগলেও বোঝে। সেই 'ভালো'টা সময় থাকতে বুঝতে পারলেই হল। না হলেই বিপদ।

কলকাতা

যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ১০ জুলাই ২০১৭

যুগশঙ্খ SUPPLI team
ক ল কা তা
শর্মিলা চন্দ্র (কো-অর্ডিনেটর ও সাব-এডিটর), **তন্ময় মণ্ডল** (সাব-এডিটর), **সুদীপ্ত বিশ্বাস, অতনু পাল**

নিউ থিয়েটার্সের কলাকুশলী

শৈবাল পত্রনবীশ

পর্ব-বারো

এনটি-র পরিচালক এবং কয়েকজন বিখ্যাত শিল্পীদের নিয়ে এর আগের পর্বগুলোতে আলোচনা করেছি। এবার চলে আসি স্ক্রিনের বাইরে যাঁদের পরিশ্রম এবং নিষ্ঠা অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। তাঁদের নিয়ে খুব একটা লেখালিখি বা আলোচনা আজ পর্যন্ত হয়নি। কিন্তু চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে ওঁদের অবদানের কোনও তুলনা হয় না। এই কাজটাকে আমরা তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করতে পারি— ক্যামেরা, সাউন্ড এবং সম্পাদনা অর্থাৎ এডিটিং। বি এন সরকার প্রথম থেকেই চলচ্চিত্রের কারিগরির আধুনিকতার ওপর নজর দিয়েছিলেন। সেই জন্যই সারা ভারত থেকেই আঞ্চলিক ভাষার ছবির পরিচালকেরা শুটিং করতে আসতেন নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে। বিদেশ থেকে যন্ত্র এনে যে ল্যাবরেটরি তিনি তৈরি করেছিলেন, সেই ধরনের পরিকাঠামো ওই যুগে ভাবাই যেত না। সরকার সাহেবের বিশ্বাস ছিল শিল্পীরা যত ভালো অভিনয় করুন না কেন, কারিগরি কৌশল সঠিক না হলে দর্শকদের আকৃষ্ট করা যাবে না।

চলচ্চিত্র নির্মাণ শৈলীতে সাউন্ড রেকর্ডিং বিষয়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ছায়াছবিতে টকিযুগ শুরু হওয়ার পর শব্দযন্ত্রীদের দায়িত্ব অত্যন্ত সতর্কভাবে পালন করতে হতো। বীরেনবাবু সাউন্ড রেকর্ডিং-এর প্রয়োজনটা বুঝতে পারলেন। কোনওরকম অপেক্ষা না করেই তিনি হলিউড থেকে মোটা মাইনে দিয়ে নিয়ে এলেন ডেমিং সাহেবকে। ডেমিং সাহেবের আধুনিক চিন্তার ফসল শীঘ্রই পেতে শুরু করলেন সবাই। ওঁর পছন্দের ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন বাণী দত্ত, মুকুল বসু, লোকেন বসু। এঁরা খুব অল্পদিনের মধ্যেই স্টুডিওর উন্নতমানের সাউন্ড রেকর্ডিস্ট তৈরি হয়ে উঠলেন। 'সাথী' এবং 'স্ট্রিট সিংগার' ছবিতে ডেমিং সাহেব মুকুল বসুকে দিয়ে কাজ করালেন। মুকুল বসু আধুনিক সিস্টেমের সঙ্গে অনেকটা পরিচিত হয়ে গেলেন। 'সাপুড়ে' ছবিতে মুকুল বসু এবং লোকেন বসু যেভাবে গান রেকর্ডিং করলেন তা আজকের দিনে অবিশ্বাস্য বাপার। ডেমিং সাহেবের আরেক ছাত্র বাণী দত্ত নিজেই অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে একটি পদ্ধতিতে পরীক্ষামূলকভাবে সাউন্ড রেকর্ডিং মেশিন তৈরি করে ফেললেন। অতুল চট্টোপাধ্যায়, শ্যামসুন্দর ঘোষ প্রমুখ টেকনিশিয়ানও কাজ করেছিলেন হাতিমার্কা ব্যানারে। ফলত ভারতের বিখ্যাত শব্দযন্ত্রীরা এনটির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে বিখাত চিত্রপরিচালক তপন সিংহও তাঁর কর্মজীবন শুরু করেছিলেন বাণী দত্তের তত্ত্বাবধানে সহকারী শব্দযন্ত্রী হিসাবে নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে।

মুকুল বসু

কারিগরি বিভাগে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে ক্যামেরা। নীতিন বসু একজন দক্ষ ক্যামেরাম্যান ছিলেন। এনটি-র অসংখ্য ছবিতে তিনি ক্যামেরার কাজ করেছিলেন। নীতিন বসু, বিমল রায়ের মতো ক্যামেরাম্যানরা আজ ভারতে নেই বললেই চলে। তাছাড়া ইউসিক মুলজি, সুধীন মজুমদার, মনু বন্দ্যোপাধ্যায়, রবি ধর শুধুমাত্র ক্যামেরাম্যানই ছিলেন না, ছিলেন ক্যামেরা-বিশেষজ্ঞও। তপন সিংহ শব্দযন্ত্রী হিসাবে কাজ শুরু করলেও ক্যামেরার কাজ যথেষ্ট ভালো বুঝতেন। এভাবেই নিউ থিয়েটার্সের চিত্রগ্রাহকেরা তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম দিয়ে প্রতিটি ছবিতে তাঁদের গবেষণার স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন।

এবার চলে আসি চিত্র সম্পাদনা প্রসঙ্গে। এখন যেমন সম্পাদনার কাজ সফটওয়্যারের সাহায্যে ডিজিটালি করা যায়, তখন কিন্তু সেরকম বন্দোবস্ত ছিল না। অনেক অজানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হতো টেকনিশিয়ানদের, কিন্তু তা সত্ত্বেও নিজেদের গবেষণার মাধ্যমেই তাঁরা প্রতিকারের রাস্তা বের করতে সমর্থ হতেন। কাজটা অত্যন্ত কঠিন ছিল। দেশীয় প্রযুক্তি ও উপস্থিত বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে সম্পাদনার কাজ সামলাতে হতো।

কচিবাবুর কথা নিশ্চয়ই অনেকে ভুলে গেছেন। তাঁর আসল নাম ছিল সুবোধ মিত্র। এক সময় তিনি নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে সম্পাদনার কাজ একা হাতে সামলেছেন। নির্বাক যুগ থেকেই তিনি এনটি-র সম্পাদক ছিলেন। পরিচালকের সঙ্গে কথা বলে তিনি এডিটিং রুমে ঢুকে যাওয়ার পরে আর কারওর সঙ্গে কথা বলতেন না। এতটাই মননশীল ছিলেন তিনি। পরিবর্তনের প্রয়োজন হলে পরিবর্তন করতেন। 'নর্তকী' ছবিতে কাজ চলাকালীন দেবকী বসু জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'কি কচি ছবিটা শেষ পর্যন্ত চলবে তো?' তার উত্তরে বলেছিলেন, 'প্রোজেক্টারে আটকাবে না।' কচিবাবু ছাড়া আরও দুজন দক্ষতার সঙ্গে সম্পাদনার কাজ করে গিয়েছেন, তাঁরা হলেন কালী রাহা এবং হরিদাস মহলানবীশ। বলিউডের বিশিষ্ট চিত্রপরিচালক ঋষিকেশ মুখোপাধ্যায় এক সময় হাতিমার্কা ব্যানারের ল্যাবরেটরি অ্যাসিটেন্ট ছিলেন। তারপর বিমল রায়ের সঙ্গে অ্যাসিটেন্ট এডিটারের কাজ করতেন। তাই সবশেষে বলা যায় যে এনটি-র সমস্ত কলাকুশলী ছিলেন এক-একজন দিকপাল। তাঁরা নিজেদের প্রচেষ্টাতেই পরবর্তী সময়ে ভারতবিখ্যাত টেকনিশিয়ান হয়ে ওঠেন।

ঘাট চতুষ্টয়ের কথা

নীহারিকা

লন্ডন শহরে টেমস নদীর পার দিয়ে স্ট্র্যান্ড ধরে সোজা এগোলে চোখে পরে বৈচিত্রে ভরা রংবেরঙের সব দৃশ্য। কোথাও সুন্দরী মহিলারা সাবেক কালের সাজ পরে বিক্রি করছেন ফুল, কোথাও-বা ইংরেজি অপেরার মহরা চলছে। এরই মধ্যে ইংরেজ যুবকদের হাতের বাদ্যযন্ত্রের সুর মিশে যাচ্ছে টেমস নদীর জলে। আবার একধারে আলোকমালায় সজ্জিত একটি বড় আকারের কাচের ঘর। শোনা যায়, সেই ঘরের অনুকরণেই রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন-সংলগ্ন বাড়ির পাশেই নির্মাণ করিয়েছিলেন কাচের মন্দির। এবার মূল প্রসঙ্গে আসা যাক। একদা ঔপনিবেশিক শহর কলকাতার গঙ্গা-সংলগ্ন রাস্তাটির নামকরণ করা হয়েছিল স্ট্র্যান্ড রোড। সামরিক এলাকা পেরিয়ে প্রিন্সেপ ঘাট থেকে এই রাস্তার সূচনা। এখান থেকে আমাদেরও চলা শুরু আর পাশাপাশি বয়ে চলেছেন মা গঙ্গা। এখনও একই জিনিসের পুনরাবৃত্তি চলছে।

আহিরীটোলার কথা গত সপ্তাহে জানিয়েছি। তার পাশেই মানিক বোসের ঘাট। পরিচয় হাতরে জানা যায় ওপার বাংলায় ঢাকা শহরের জনৈক বণিকের নামে এই ঘাটের নামকরণ। এটি অবশ্যই একটি স্নানের ঘাট। নামকরণ অতীতে আর আপাতত কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের অধীনে ঘাটের রক্ষণাবেক্ষণ হচ্ছে। এগিয়ে যাই, সামনে রয়েছে মোহনটুনি, বেনিয়াটোলা, রথতলা এবং জগন্নাথ ঘাট। একই ঘাটের কি এতগুলি নাম, না প্রতিটি ঘাট ভিন্ন, সে-কথা জানতে গঙ্গার শীতল হাওয়ায় এগোতে হবে। এখানেও এগোতে গেলে চোখে পড়ে এক এক ধরনের দেব-দেবীর মূর্তি, যেগুলি বিসর্জন দেওয়া হবে বলে অশ্বত্থ এবং বটের ছায়ায় অপেক্ষারত। শোনা যায়, দেবী শীতলার মূর্তি জলে ভাসান দেওয়ার রীতি নাকি নেই। তাই এই গাছতলাতেই দর্পণ বিসর্জনের পরেও তাঁর অবস্থান। তাঁরই পাশে সহাবস্থান করছেন কার্তিক, গণেশ, গোপাল এবং দেবী কালীকা। প্রতিটি ঘাটের ঢালু জমিতে পরে রয়েছে অসংখ্য মৃন্ময়ী মূর্তির কাঠামো।

স্ট্র্যান্ড ধরে এগোতে এগোতে দেখতে পাই ছোট-বড় বেশ কয়েকটি মন্দির। তার মধ্যে রয়েছে শিবমন্দির, হনুমান মন্দির, রাধা-কৃষ্ণের মন্দির। এরই মাঝে জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রার দেবালয়ও রয়েছে। শোভাবাজার (কেটুয়া স্ট্রিট)-এর পশ্চিমে রয়েছে বেশ কয়েকটি ঘাট। আর প্রতিটি ঘাটের সঙ্গেই কোনও না কোনওভাবেই সম্পর্ক রয়ে গেছে প্রভু জগন্নাথের। ওড়িশার বঙ্গোপসাগর উপকূলে যেমন তিনি বিরাজ করছেন, এই বঙ্গের হুগলি নদী তীরবর্তী ঘাটের কিনারাতেও তিনি পূজিত হন। শুধু বিগ্রহ নয় ঘাটগুলির সম্পর্ক রয়েছে রথ এবং মোহান্তর সঙ্গেও। তাই বোধহয় ঘাটের নামকরণ হয়েছে রথতলা ঘাট। এইখানে শ্রাবণে রথের মেলা বসে কিনা জানা নেই। ঘাটের অন্য আরেকটি নাম হল হুরোচাঁদ মল্লিক স্নানের ঘাট।

আমার বাঁয়ে যেমন মা গঙ্গা প্রবাহিতা, তেমনই ডাইনে চক্ররেলের লাইন তার গতির জানান দিচ্ছে। সেই লাইনের ধারেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে একাধিক পুরনো বাড়ি না বলে অট্টালিকা বলাই ভালো। সেখানকার স্থাপত্যশৈলীতেও অতীতের ছোঁয়া। এরপরেই পড়বে মহিলাদের স্নানের ঘাট, একদা যার নাম ছিল কেটুয়া ঘাট। এখন এটির নাম চাঁপাতলা ঘাট। শোভাবাজার ঘাট ছাড়িয়ে এগিয়ে চলি কুমোরটুলি ঘাটের উদ্দেশ্যে। এখানে স্নানও যেমন হয়, তেমনই প্রয়োজনে পারলৌকিক ক্রিয়াও সম্পন্ন হয়। পাশাপাশি নৌকার মাধ্যমে এসে পৌঁছয় এঁটেল মাটি। আর সেই মাটি দিয়ে নদিয়া, বর্ধমান, হুগলি থেকে আসা কুমোরটুলির মৃৎশিল্পীরা তৈরি করেন নানা দেব-দেবীর মূর্তি। ইতিহাস বলে, এই ঘাটে অতীতে প্রায়ই আসতেন ঠাকুর রামকৃষ্ণ। তখনকার দিনের বিখ্যাত কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেনের বাড়িতে এলেই এই ঘাটে তাঁর পদধূলি পড়ত। এই প্রতিটি ঘাটের রক্ষণাবেক্ষণও করে থাকে কলকাতা পোর্ট ট্রাস্ট। আরও এগোলে, আরও ঘাট, সেসবের কথা জানাতে গেলে প্রয়োজন সময় আর জায়গা। আজ দুটোরই অভাব। তাই অগত্যা সামনের সপ্তাহে।

গঙ্গার ঘাটের পাশে থাকা পুরনো বাড়ি

গঙ্গার ঘাটে পড়ে থাকা বিকৃত হয়ে যাওয়া মূর্তি

কুমোরটুলি ঘাট

কারা যেন বারান্দা দিয়ে হেঁটে বেড়ায়

সোমনাথ আদক ও সৌরভ মণ্ডল

কথায় বলে, ‘বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর’— হ্যাঁ, যুক্তি যেখানে মুখ থুবড়ে পড়ে, তর্ক সেখানে থমকে যায়। আর সেখান থেকেই শুরু হয় মিথের ক্র্যাচে ভর দিয়ে চলা। বিশ্বাস, অন্ধ-বিশ্বাস, সংস্কার, কুসংস্কার তা সে যাই হোক। সাদা-কালোর প্রাচীন শহর থেকে আজকের প্রাসাদ নগরীর আলো, জল, হাওয়ায়, অলিতে-গলিতে কান পাতলে শুনতে পাওয়া যায় এমনি অনেক রোমহর্ষক কাহিনি। লোক থেকে লোক মুখে ঘুরতে থাকা সে কাহিনির ব্যাখ্যা দিতে পারে না আজকের আধুনিক বিজ্ঞানও, আবার তাকে অস্বীকারও করা যায় না সহজে। একবিংশ শতাব্দীর টেকনোলজি ফর ম্যানকাইন্ড-এর যুগে রিমোট হাতে আপনি যখন ভাবছেন বাড়িতে একটা রোবট রেখে মুশকিল আসানের কথা, ঠিক তখনি যদি একটা ছায়াশরীর হঠাৎ দেখা দিয়েই মিলিয়ে যায় তাহলে কি একবার হলেও বিস্মিত হবেন না আপনি? নাকি তখনও বলবেন ভূত-টুত বলে কিস্যু নেই মশাই। সে আপনি বলতেই পারেন। কিন্তু বিবাদি বাগের লাল দিঘির উত্তরদিকের লাল রঙের বাড়িটির আশপাশের লোকেরা যে অন্য কথা বলে। কী সেই কথা জানব। তবে তার আগে এই বাড়িটার একটা পরিচয় দেওয়া দরকার।

পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতার একেবারে প্রাণকেন্দ্র, ডালাহৌসি স্কোয়ারে অবস্থিত লাল রঙের এই চারতলা বাড়িটি প্রায় ২৫০ বছর ধরে ইউরোপীয় গথিক স্থাপত্যের স্মৃতি হিসাবে আজও ইতিহাসের নীরব সাক্ষী বহন করে। হ্যাঁ, কয়েক বছর আগে পর্যন্ত (নবান্ন হওয়ার আগে) এটাই ছিল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের প্রধান সচিবালয় বা মুখ্যমন্ত্রীর সদর দপ্তর। যার নাম রাইটার্স বিল্ডিং বা মহাকরণ। ১৭৭০ সালে ২.৮ একর জমির ওপর স্থাপিত হয় এই বিল্ডিংটির নকশা তৈরি করেন টমাস লায়েন্স। ১৭৭৬ সালে লায়েন্স ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির করণিকদের জন্য তৈরি করেন ১৯টি অ্যাপার্টমেন্ট। এগুলিকে সারিবদ্ধ দোকানের মতো দেখতে ছিল। ১৮০০ সাল পর্যন্ত এটি কোম্পানির প্রশাসনিক কর্মী ও করণিকদের আবাসিক ভবন হিসাবে ব্যবহৃত হতো। ব্রিটিশরা এই করণিকদের রাইটার বলতেন। সেখান থেকেই এই ভবনটির নাম হয় রাইটার্স বিল্ডিং।

পশ্চিমবঙ্গের এই ভবনটির সাথে যেমন লেগে আছে ইউরোপীয় স্থাপত্য শৈলীর ছোঁয়া, ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাস, বঙ্গীয় রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়গুলি তেমনি লেগে আছে গা ছম ছম করা রোমহর্ষক নানা কাহিনি। শোনা যায়, কলকাতার অন্যতম এই রাইটার্স বিল্ডিং-এ রাত নামলে প্রশাসনিক ভবনের জনশূন্য অলিন্দ জমে ওঠে অশরীরিদের আড্ডা। বিভিন্ন রকম ভৌতিক ঘটনা স্বচক্ষে দেখার কথা স্বীকার করে নেন এখানে রাত কাটানো প্রতিটা নৈশপ্রহরী। জানা যায়, মোটেই সুবিধের নয় এই বিল্ডিংয়ের পাঁচ নম্বর ব্লকটি। রাত নামলে এখানে নাকি প্রায়শই নানা রহস্যজনক দৃশ্য দেখা যায়। কারা যেন এখানকার বারান্দা দিয়ে হেঁটে বেড়ায়। দৌড়ে গিয়েও দেখা যায় না কাউকে। বছরের পর বছর এই বাড়ির পেল্লাই ফাঁকা ঘরগুলি থেকে একটানা টাইপের আওয়াজ শোনা যায়। দোতলায় কারা যেন ভেসে উঠে মুহূর্তেই মিলিয়ে যায়। লালবাড়ির আশপাশের বাড়ির বাসিন্দারা বলেন, মাঝে মধ্যেই নাকি রাইটার্স বিল্ডিং থেকে হাড় হিম করা সব শব্দ শোনা যায়। শোনা যায় কান্নার আওয়াজও। ইতিহাস বলছে, একসময় এখানেই বিশাল গাজাগাছ আর কলাগাছের জঙ্গল ছিল। জানা যায় একবার বেশ কয়েকজন ইংরেজকে এখানেই কবর দেওয়া হয়েছিল। লর্ড ভ্যালেন্টিনের তথ্য অনুযায়ী ঘোড়ায় টানা গাড়ির খেলা বা বন্দুক যুদ্ধ চলত এই এলাকায়। খুন, জখম লেগে থাকত প্রায়শই। আজও এমনই বহু ঘটনার কথা এখানকার এলাকাবাসীর মুখে মুখে ফেরে। আবার স্বাধীনতা সংগ্রামী বিনয়, বাদল, দীনেশের হাতে কর্নেল এন. জি. সিম্পসনের খুন হওয়ার ঘটনাও একবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। লোকমুখে শোনা যায় এখানে নাকি অনেকেই দেখেছেন লালমুখো সিম্পসন সাহেবের ভুতকে।

সব মিলিয়ে ইতিহাসের সাক্ষী বহন করা ব্রিটিশদের রাইটার্স বিল্ডিং বা খোদ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই প্রশাসনিক দপ্তরটির অন্দরে-বাইরে লোকমুখে প্রচারিত যে কাহিনি হতেই পারে এর কোনও ভিত্তি নেই, বা হয়তো ইতিহাসের গর্ভ থেকে ইঙ্গিত দিচ্ছে কাহিনির সত্যতা। তবু ‘তেনাদের’ কথা একেবারে অস্বীকার করা যায় কি!

কলকাতা

যুগশঙ্খ SUPPLI

সোমবার, ১০ জুলাই ২০১৭

প্রয়োজনে লাগতে পারে

সেন্ট জন্স অ্যাম্বুলেন্স - ২২৪৮৫২৭৭

কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (অ্যাম্বুলেন্স) - ২২৩৯২২৩২, ২২৩৯২২৩৩

বেল ভিউ নার্সিং হোম - ২২৪৭৭৪৭৩, ২২৪৭২৩২১

কোঠারি মেডিক্যাল সেন্টার অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট - ২৪৫৬৭০৫০, ২৪৭৯২৫৬১

ক্যালকাটা হসপিটাল অ্যান্ড মেডিক্যাল রিসার্চ - ২৪৫৬৭৭০০, ২৪৭৯১৮০৫

এসএসকেএম হসপিটাল (পিজি) - ২২২৩৬০২৬, ২২২৩৬২৪২

কলকাতা

যুগশঙ্খ SUPPLI

সোমবার, ১০ জুলাই ২০১৭

এই ক্রোড়পত্রের সমস্ত লেখার মতামতই লেখকদের নিজস্ব।

যতবার দেখেছি প্রত্যেকবারই নতুন মনে হয়েছে

আব্দুস সাদেক লিপন (চিত্রশিল্পী)

মানুষের প্রিয় কিছু নিয়ে লিখতে দিলে আমার মতো অনেক না-লিখিয়ে লোকও দু-চার কলম লিখে ফেলে। কলকাতা আমার কাছে সেরকমই একটা প্রিয় জায়গা। আসলে দুটো দেশের কৃষ্টি-সংস্কৃতি এতটাই অভিন্ন যে কলকাতা শব্দটা আমাদের মনে ঢুকে গিয়েছিল, ছোটবেলা থেকেই। অনেক স্বপ্ন ছিল এই শহরটার সংস্পর্শে আসার, শহরটাকে ছুঁয়ে দেখার। আসলে কলকাতা নামটা শুনলেই মনের ভেতর কেমন একটা অদ্ভুত আবেগ কাজ করে। হয়তো সেটা ভাষার আবেগ, হয়তো সেটা সংস্কৃতির আবেগ। আর সেই আবেগের সূত্র ধরে আমার মনে হয় বাঙালি যেখানেই আছে, তার একসূত্রে বাঁধা।

প্রথমবার কলকাতা যাওয়াটা নিছকই, শুধু বেড়াতে। ব্যাপারটা এরকম ছিল যে, পাসপোর্ট হয়েছে যাই একটু ওদেশ থেকে ঘুরে আসি। আসলে কলকাতাকে বিদেশ বলতে বা ভাবতে দুটোতেই আমার আপত্তি আছে। প্রথমবার কলকাতা গেছিলাম আমরা দুই বন্ধু মিলে, আমি আর কাজী মাকিন। দু'জনেই ছবি আঁকার লোক। সে সূত্রে কলকাতাতে বেশ কিছু বন্ধুবান্ধবও ছিল। আসলে যারা ঢাকায় আসেনি এমন কারওর সাথে তো সেই সময়ে বন্ধুত্ব করার উপায় ছিল না। এখনকার মতো ফেসবুকের বা আরও কীসব আছে এগুলোর রমরমা ছিল না। কলকাতায় সেবার গিয়ে উঠেছিলাম মারকুইস স্ট্রিটের একটা সস্তার হোটেলে। পরের দিন সকালে চলে গেলাম কফি হাউসে। তিনজন কলকাতার বন্ধুর নম্বর ছিল, ফোন করলাম। সুবিমল রায়কে পেয়ে গেলাম। শুরু হল আড্ডা। তাঁর সূত্রেই পরিচয় হল আরও অনেকের সাথে। তারপর বিধান সরণি ধরে আমরা তিনজন হাটতে লাগলাম হেদুয়ার দিকে। হাঁটছি আর আলোচনা হচ্ছে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে। সেখান থেকে আবার কলেজ স্ট্রিট। সেখানেই দেখালাম সেদিনের সন্ধে নামা। এই বিপুল বই সাম্রাজ্য, ঐতিহ্যময় কফি হাউস, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়— এ অঞ্চলের মুগ্ধতাই আলাদা। সন্ধে নামার পর আমি আর কাজী চলে গেলাম পার্ক স্ট্রিট। সেখানের কথা আর কী বলব মনে হল এই অঞ্চলটিই আলোকোজ্জ্বল কলকাতার রাজধানী। ঘুরলাম নিউ মার্কেট চত্বর। কেনাকাটাও করলাম। পরের দিনটা ছিল শহর ঘোরার আরেক দিন সেদিন গেলাম নন্দন চত্বরে, সেখানে অ্যাকাডেমিতে একটা নাটকও দেখেছি। উহ! সে এক অসম্ভব সুন্দর অভিজ্ঞতা। তারপর দিন ছিল দেশে ফেরার পালা। মনখারাপের দিন। ট্রেনে উঠেও জানালার বাইরে তাকিয়ে বারবার মনে হচ্ছিল যদি আর কটা দিন থাকতে পারতাম।

এ গেল আমার প্রথম কলকাতা ভ্রমণের কথা পরে অনেকবারই কলকাতা গেছি। অনেক প্রিয় মানুষ, প্রিয় বন্ধু আছেন কলকাতায়। তবে আজ শুধু প্রথম দিনের কথাই লিখলাম। সময় সুযোগ হলে আবারও লিখব। কলকাতাকে যতবার দেখেছি প্রত্যেকবারই নতুন মনে হয়েছে। কলকাতাও বদলাচ্ছে। আর প্রত্যেকবার গেলেই সেই পরিবর্তন চোখে পড়ে। সময় এগিয়ে গেছে। আমরাও বদলেছি সময়ের সাথে। আজ আর সুবিমল নেই তবু প্রথম কলকাতা যাওয়া, সেইসব সুখের মুহূর্তরা স্মৃতির পটে আজও উজ্জ্বল।

ফোটো: সৌরভ সরকার

বিজয় সরকার

হৃদয় মালাকার

সময়ের ধারায় বহু মানুষের উত্থান হয়, যারা নিজ নিজ ক্ষেত্রে তৈরি করেন এক নতুন ঘরানা-নতুন আঙ্গিক। আগামীর কাছে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে তাঁরা বেঁচে থাকেন নিজের সৃজন ও সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে। সংগীতের ইতিহাসে এমনি এক উজ্জ্বল নাম বিজয় সরকার।

নবকৃষ্ণ বৈরাগী ও হিমালয়া কুমারীর সুযোগ্য সন্তান বিজয় সরকার ১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯০৩ সালে বাংলাদেশের নড়াইলের ডুমদি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্থানীয় টাবরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ার সময়ে নেপাল বিশ্বাস নামক একজন শিক্ষকের কাছে শেখেন যাত্রাগানের উপযোগী নাচ, গান ও অভিনয়। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য তিনি বেশ কয়েকটি স্কুল পরিবর্তন করেন। সব জায়গায়তেই তিনি এমন একাধিক শিক্ষকের সংস্পর্শে আসেন যাঁদের থেকে গান শেখার সুযোগ পান। অল্প বয়সে বিজয়

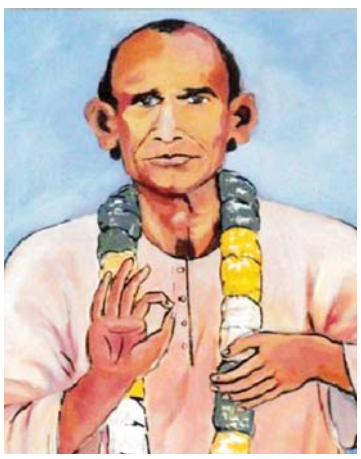

সরকারের বাবা-মা মারা যাওয়ায় পড়াশোনার গণ্ডি বেশিদূর টানতে পারেননি। শিক্ষাগত যোগ্যতা দশম শ্রেণি পর্যন্তই আটকে থাকে।

বিজয় সরকার পরবর্তীকালে বাংলাদেশ থেকে ভারতে চলে আসেন। তারপর তাঁর জীবনের এক নতুন অধ্যায় শুরু হয়। ১৯২৫ সালে গোপালগঞ্জের কবিয়াল মনোহর সরকারের কাছে প্রথম কবিগান শেখেন। কিছুদিন পর রাজেন্দ্রনাথ সরকারের সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁর কাছ থেকেও কবিগানের তালিম নেন। তারপর ১৯২৯ সালে নিজের একটি গানের দল করেন এবং কবিয়াল হিসাবে প্রথমে পরিচিতি ও পরে জনপ্রিয়তা লাভ করেন। এরপর একের পর এক তিনি অসংখ্য গান রচনা করেন এবং সেগুলোর সুরও তিনি নিজে দিয়েছেন। ভাটিয়ালি গানের উপর ভিত্তি করে 'ধুয়া' গান তাঁকে সকলের কাছে জনপ্রিয় করে তোলে। বিচ্ছেদ গানের অন্যতম প্রধান প্রাণপুরুষ বলা হয়ে থাকে বিজয় সরকারকে। তার ভক্ত ও স্থানীয়দের কাছে 'পাগল বিজয়' হিসাবে সমধিক পরিচিত ছিলেন তিনি। মঞ্চে প্রোগ্রাম চলাকালীন তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু সংবাদ আসে। প্রচন্ড শোকের মধ্যে দিয়েও অন স্পট গান রচনা করেন-'পোষা পাখি উড়ে যাবে সজনী একদিন ভাবি নাই মনে।' পাগল বিজয় সরকারের বিখ্যাত গানের মধ্যে— 'এ পৃথিবী যেমন আছে', 'পোষা পাখি', 'তুমি জানো নারে প্রিয়', 'আষাঢ়ের কোন ভেজা পথে', 'ভাব না জেনে পিরিত করনা', 'দরদিয়া রে কোন দেশে যাব', 'আমার জনম গেলো বিফলে', 'একটা চিঠি লিখি তোমার কাছে' ইত্যাদি অন্যতম।

১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধের পর থেকে ১৮৫৯ সাল পর্যন্ত কবিয়ালদের প্রতিষ্ঠা চরমে উঠেছিল। পাগল বিজয় কবিয়াল হিসাবে পরিচিত হলেও সংসার বিবাগী, উদাসী বা আখরাবাসী ছিলেন না। সারাজীবনে তিনি মূলত দুটো ধারায় গান করেছেন— কবিগান ও রামায়ণ গান। মাঝে মধ্যে জারিয়ালদের সঙ্গে কবি-জারির পাল্লাও করেছেন। বাংলা সংগীত জগতে কবিয়াল বিজয় সরকার কবিগানকে বিশেষরূপে উপস্থাপন করেন। তাঁর কবিগান নিরপেক্ষ নবতর সংগীত হিসাবে শ্রোতাদের প্রাণে এক নব চেতনার উন্মেষ ঘটায়। এছাড়া বিজয় সরকারের নিরপেক্ষ স্বরবৃত্ত ছন্দের অপূর্ব কবিগান সংগীত জগতে রেনেসাঁর সৃষ্টি করে।

পরে তিনি ভাটিয়ালি সুরের সঙ্গে বাউলসংগীতের অন্তর্ধর্ম মিশিয়ে এক নতুন ধরনের গান উপস্থাপন করেন যা লোকসংগীতের বিশাল বৈচিত্রময় আঙিনায় একটি পৃথক ঘরানার সৃষ্টি করেছে। এই গানগুলোকে বিচ্ছেদ 'ভাটিয়ালি গান' বলে ধরে নেওয়া হয়। বিজয় সরকারের গানগুলো শিক্ষিত-অশিক্ষিত সব শ্রেণির মানুষের হৃদয়স্পর্শী। তাঁর রচিত গানের সংখ্যা প্রায় চারশো।

কাজী নজরুল ইসলাম, জসীমউদ্দীন, আববাসউদ্দীন আহমদ প্রমুখ মনীষীর সঙ্গে বিজয় সরকারের ঘনিষ্ঠতা ছিল। বিজয় সরকার প্রায় ৫৫ বছর সংগীতসাধনা করেছেন। তিনি বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলা অ্যাকাডেমি ও শিল্পকলা অ্যাকাডেমিতে সংগীত পরিবেশন করে বহু পুরস্কার ও সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। ১৯৮৫ সালের ৪ ডিসেম্বর বিজয় সরকার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বিজয় সরকারের মৃত্যুর পর ২০১৩ সালে বাংলাদেশ সরকার তাঁকে মরণোত্তর 'একুশে পদক' সম্মাননা প্রদান করে।